উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস

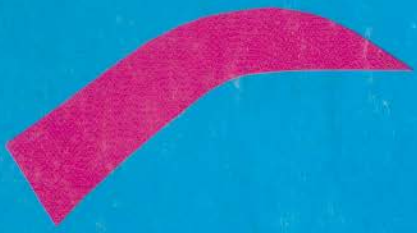

মাওলানা মাসউদ আলম নদভী

উপমহাদেশে
ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস

মাওলানা মাসউদ আলম নদভী
অনুবাদ সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

শতাব্দী প্রকাশনী

www.pathagar.com

শ প্র: ২৫

উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস

মাওলানা মাসউদ আলম নদভী

অনুবাদ সম্পাদনা

আবদুস শহীদ নাসিম

প্রকাশক

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার

ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা- ১২১৭

ফোন ঃ ৮৩১১২৯২

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর : ২০০২

মুদ্রণে

আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস

৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭

নির্ধারিত দাম : দশ টাকা মাত্র

History of Islamic Movement in the Sub-Continent by Maulana Masud Alam Nodvi, Published by Shotabdi Prokashoni. Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy. 491/1 Elephant Road, Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka- 1217.

Fixed Price : Tk.. 10.00 only.

www.pathagar.com

আমাদের কথা

উপমহাদেশের খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ প্রখ্যাত আলেমে দীন মাওলানা মাসউদ আলম নদভী ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব। ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাসের উপর তাঁর অগাধ পান্ডিত্য সর্বজনবিদিত। উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস সংক্রান্ত এই মূল্যবান পুস্তিকাটি মূলত ১৯৫১ ঈসায়ী সনের ১১ নবেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর জাতীয় সম্মেলনে মাওলানা নদভী প্রদত্ত ভাষণ।

এই পুস্তিকাটিতে পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের উপর একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মৌলিক ধারণা পেশ করা হয়েছে। পুস্তিকাটি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত ভেবে একাডেমী এটি অনুবাদ করেছে।

বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন স্নেহ ভাজন মাওলানা জাকির হোসাইন এবং মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি । আল্লাহ পাক তাদের খেদমত কবুল করুন ।

আবদুস শহীদ নাসিম
পরিচালক
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

- উপমহাদেশে ইসলামের সাধারণ অবস্থা ৫
- হিজরি দশম শতাব্দী ৭
- গোমরাহির যুগ ৯
- মুজাদ্দিদ আলফেসানি (র) ১১
- শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) ১৫
- সম্রাট আওরঙ্গযেব আলমগীর ১৫
- শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র) ১৬
- শাহ ওয়ালিউল্লার সন্তান ও শিষ্য-শাগরিদ ১৯
- শহীদানে বালাকোট ২০
- ১৮৫৭ সালের বিপ্লব ২২
- নাদওয়াতুল উলামা ২৪
- রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব ২৫
- ইসলামী আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন ২৮

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উপমহাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস

উপমহাদেশে ইসলামের সাধারণ অবস্থা

হিজরি প্রথম শতাব্দীতেই এই উপমহাদেশ ইসলামের আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছিল। সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামের বরকতময় পদধূলি থেকেও এ উপমহাদেশ বঞ্চিত হয়নি। তথাপি একথা সত্য, ইসলামের সূর্যরশ্মি প্রথম দিকে উপকূলবর্তী এলাকাসমূহ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। আরব বণিক ও নাবিকগণ দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল অতিক্রম করে সমুদ্র পথে শ্রীলংকা এবং পূর্ব ভারতের দ্বীপ- উপদ্বীপসমূহে আসা যাওয়া করতেন। তাঁরা দেশের অভ্যন্তরে খুব কমই প্রবেশ করতেন। একইভাবে প্রখ্যাত সিন্ধু বিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসিম নিজের মহোদ্যম সিন্ধু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেই স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। উপমহাদেশের উত্তর সীমান্তের অধিবাসীদের দুর্ভাগ্য, তারা আরব বিজয়ীদের পদচারণা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলো। ঐসব এলাকায় তাঁদের স্থলে এমন সব বিজয়ী এবং দিক-বিজয়ীদের আগমন ঘটেছিল, যাদের অধিকাংশই ছিলেন ইসলামে নব দীক্ষিত। তুর্কি ও মোগল বিজয়ীগণেরও এখানে আগমন ঘটে। তবে তাদেরও অধিকাংশই ছিলেন ইসলামে নবদীক্ষিত। তুর্কি ও মোগল বিজয়ীগণ তো এমন সময় ইসলাম গ্রহণ করেন যখন খোদ ইসলামের প্রাণকেন্দ্রগুলোতেই (হিজায, ইরাক এবং সিরিয়া) আদর্শ বিচ্যুতি শুরু হয়। তাছাড়া আব্বাসীয় শাসকগণ তাদের নওমুসলিম রাজকর্মচারীদের হাতে তো শিশুর খেলনায় পরিণত হয়ে পড়ে। সাধারণত তারা ইসলামের যুদ্ধনীতি সম্পর্কে ছিলো অনভিজ্ঞ। তাদের সেনাবাহিনীতে নওমুসলিমদের সংখ্যাই ছিলো অধিক। শিক্ষা দীক্ষার অবস্থা ছিলো আরো করূণ! মাহমুদ গজনবীর পূর্বে তাদের দেশে কোনো মাদ্রাসা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ছিলনা। একারণেই খাইবারের গিরিপথ দিয়ে এদেশে আগমনকারীদের অধিকাংশ লোকই শিক্ষা দীক্ষার দিক থেকে ছিলো অজ্ঞ। এই রাজা বাদশা এবং দিক-বিজয়ী শাসকগণ রাষ্ট্র পরিচালনা এবং যুদ্ধ সন্ধি ইত্যাদিতে যতো সুনাম দক্ষতা এবং যোগ্যতার অধিকারীই ছিলেন না কেন, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা,ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও সুবিচারের বাস্তব নমুনা

www.pathagar.com

প্রদর্শনের দিক থেকে তাদের তেমন বিশেষত্ব ছিলনা। বরঞ্চ একথা তিক্ত হলেও সত্য যে, এই রাজা-বাদশাহদের ব্যবহারিক জীবন ও রাজনৈতিক কর্মপন্থা ইসলাম সম্পর্কে এমন সব ভ্রান্ত ধারনা সৃষ্টি করে দেয়, যা এক দীর্ঘ নিরলস প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত দূরীভূত করা সম্ভব হয়নি। সার কথা, এই উপমহাদেশের বিরাট একটি অংশে ইসলামের এমন সব পতাকাবাহী এসেছিলেন যারা নিজেরাই সঠিক ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। তাছাড়া যতটুকু তারা জানতেন সে অনুযায়ী আমল করতেন না। ফলে যে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা একটি স্বতন্ত্র আকীদা- বিশ্বাস ও সর্বজনীন জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর বিজয়ী হবার জন্য এসেছিল, ভারত উপমহাদেশে তা শিরক এবং জাহেলিয়াতের স্তুপে ঢাকা পড়ে যায়। হিজায থেকে তাওহীদের যে অনাবিল স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়ে আসছিল, গঙ্গা-যমুনা-মেঘনার মিলিত ধারা তাকে অস্বচ্ছ ও ঘোলাটে করে ফেলে। তাওহীদি আকীদা বিশ্বাস শিরকের সংমিশ্রণে বিবর্ণ হয়ে যায়। সত্য দীনের পরিচ্ছন্ন জীবন পদ্ধতি জাহেলি রীতিনীতির স্পর্শে বহু বিকৃতির শিকার হয়ে পড়ে।

আমরা জানি, এমন কি এ দেশের অমুসলিমরাও এটা স্বীকার করে নিয়েছে যে, সমগ্র ভারত উপমহাদেশে ইসলামের রয়েছে বিরাট অবদান। তবে এর সঙ্গে এটাও স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এ দেশে ইসলামের প্রতি করা হয়েছে বিরাট যুলুম। একথা যেমন সত্য যে, বহিরাগত মুসলমান এবং স্থানীয় ভাবে ইসলাম গ্রহণকারীরা নিজেদের শত দুর্বলতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও যতটুকু ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছেন এবং অল্পবেশী তার উপর আমল করেছেন, এর সাহায্যে এ উপমহাদেশে আকীদা বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা সংস্কৃতিতে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

একইভাবে এটাও সত্য যে, বহিরাগত মুসলমানরা এখানকার রসম-রেওয়াজ ও চিন্তা-ধারার যেসব প্রভাব গ্রহণ করেছিলেন ও স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে সেগুলোর যা অবশিষ্ট ছিলো, তার দ্বারা কেবল ইসলামী জীবন ব্যবস্থারই তারা বিকৃতি সাধন করেনি, খোদ ইসলামের আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তা ধারায়ও ভ্রান্ত চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন। এভাবে এমন এক ধরনের ক্ষতি সাধন করা হয় যা অতীতের সকল যুগের সংস্কারকগণ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেন এবং তা দূরীভূত করার চেষ্টাও করেন । বিশেষ করে মুজাদ্দিদে আলফেসানির. (১০৩৪ হিঃ) -এর যুগ থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত গত সাড়ে তিন শত বছর

www.pathagar.com

ধরে এ সংশোধনের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও শত শত বছরের জমে থাকা এ মরিচা সম্পূর্ণ ভাবে দূরীভূত করা সম্ভব হয়নি।

হিজরি দশম শতাব্দী

গোটা হিমালয়ান উপমহাদেশেই এটা ছিলো ইসলামের সাধারণ অবস্থা। কমবেশি প্রতিটি যুগেই এখানকার মুসলমানদের মন-মগজ হিন্দুয়ানি ভাবধারা ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত ছিলো। কিন্তু হিজরি দশম শতাব্দীর পূর্বে কুফর ও শিরকের এ অমানিশা একেবারে চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছে। এই ভাবধারা তাসাউফ, প্রাচ্য দর্শন ও বেদান্তিক দর্শন সবকিছুকেই বিকৃত করে ফেলে। সর্বত্র ছিলো বিদআত, শিরক ও কুসংস্কারের দৌরাত্ম্য। এখানকার মুসলিম জীবনের কোনো একটি স্তরও শিরকের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলনা।

এ করুণ অবস্থার প্রধানতম কারণ ছিলো কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুতি এবং কুরআন-সুন্নাহর প্রতি অবহেলা ও অমনোযোগিতা। এই বিচ্যুতি ও অবহেলার বড় কারণ এই ছিলো যে, উত্তর ভারতে যেমন ইসলাম এসেছে মধ্য এশিয়া থেকে, তেমনি ধর্মীয় জ্ঞানও সে দিক থেকেই এসেছে। এসব কারণে ওখানকার ওলামায়ে কিরামের ধর্মীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিলো ফেকাহ এবং উসূলে ফেকাহ পর্যন্ত । একই কারণে উত্তর ভারতের শিক্ষা প্রশিক্ষণও ফেকাহ এবং উসূলে ফেকাহর মধ্যে সীমিত থেকে যায়। তাই ফকীহদের ফতওয়া এবং ফেকহী মসলা-মাসায়েলকে মূল দীনের মতোই গুরুত্ব দেয়া হতে থাকে। বলাবাহুল্য, কুরআন হাদীসের মূল শিক্ষার ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক।

অপর দিকে যেহেতু গুজরাট এবং উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে আরবদেশ থেকে ইসলামী শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ আলেমদের আগমন অব্যাহত ছিলো, তাই সেখানে 'আমাদের কাছে অমুকে হাদীস বর্ননা করেছেন' এবং 'রাসূল (স) এর কর্ম ও বক্তব্য সম্পর্কে অমুকে খবর দিয়েছেন' এসব বাক্যের কলধ্বনি হতে থাকে। উপকূলীয় এই এলাকা সমূহে কুরআন হাদীস চর্চার প্রাধান্য ততোদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো, যতদিন উত্তর ভারতের কোনো প্রভাব তাদের উপর পড়েনি। দুই শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় (৭৯৯-৯৮০হিঃ) এটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব মুক্ত ছিলো এবং এই এলাকাটি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ অনুশীলনের প্রাণ কেন্দ্র ছিলো। মোগল সম্রাট আকবর যখন (৯৬৪-১০১৪ হিঃ) গুজরাট প্রদেশও তার শাসন বলয়ের অধীনে নিয়ে নিলেন, তখন সেই এলাকাকেও

www.pathagar.com

একই জাহেলি অন্ধকার ছেয়ে ফেলে। তবে উত্তর ভারতে হাদীস চর্চা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি। শায়েখ আবদুল হক (১০৫২হিঃ) এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর (১১৭৬ হিঃ) পূর্বে উপমহাদেশের এই উত্তর অঞ্চলে হাদীসের ব্যাপক চর্চা ছিলনা । হিজরি দশম শতাব্দীর পূর্বে উত্তর ভারতে শুধুমাত্র একজন সুবিখ্যাত হাদীস বেত্তার নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন হাসান র: (৬৫০ হিঃ)। এর তিন শতাব্দী পরে শায়েখ আলীমোত্তাকীকে (৯৭৫ হিঃ) হাদীস শিক্ষাদানের মহৎ কাজে নিয়োজিত দেখা যায়।

হিজরি দশম শতাব্দী পর্যন্ত এই উপমহাদেশের সাধারণ অবস্থা এটিই ছিলো। আল্লাহর এই জমীন তাঁর নেক বান্দা থেকে কখনও সম্পূর্ণ খালি ছিলনা। জাতির শুভাকাঙ্খী মহান পথ প্রদর্শকগণ ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ সব সময়ই চালিয়ে যেতে থাকেন।

রাজা-বাদশাহদের মধ্যে মুহাম্মদ তুঘলুক (৬৭৫-৭৫২হিঃ), ফিরোজ তুঘলুক (৭৫২-৭৯০হিঃ) এবং সিকান্দার লোদীর (৮৯৪-৯২৩ হিঃ) নামই পাওয়া যায়, যাঁরা নিজেদের সততা, প্রজ্ঞা ও সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট ছিলেন। তবে ইসলামের ব্যাপারে পরিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী লোকের অভাব, ধর্মীয় ব্যাপারে উদাসীনতা এবং বিশেষ করে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক নিয়ম বিধির ব্যাপারে জ্ঞানের অভাবে তারা প্রায় সময় এমন কিছু কাজও করে বসতেন ইসলামী আইনে যেগুলোর অবকাশ ছিলনা।

তবে এই কথা স্বীকার করতেই হবে যে, উপমহাদেশের ইতিহাসে এসব আল্লাহভীরু রাজা-বাদশাহর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের কোনো ঐতিহাসিকই কোনো অবস্থায় তাঁদের সেই মর্যাদাকে উপেক্ষা করতে পারবেননা।

হিজরি দশম শতাব্দীর পূর্বেকার এসব সংস্কারধর্মী দীনি দাওয়াত ও আন্দোলনে আলেম সমাজের ভূমিকা তেমন উজ্জ্বল ছিলো না। তৎকালীন অবস্থা পর্যালোচনা করলে মনে হয়, দীন ও দীনের দাবি অনুযায়ী তৎপর সঠিক আলেমের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিলো। আর যারা ছিলেন তাদেরও অধিকাংশই ছিলেন নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে অসচেতন। অবশ্য এই মাত্র যাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হলো তাদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক আমলধারী প্রচার বিমুখ সূফীবুযর্গ অবশ্যই ছিলেন, যারা স্ব স্ব স্থানে ইসলামের প্রচার- প্রসারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

www.pathagar.com

মূলত এ সকল মুসলিম সূফী সাধক ও ইসলামের সেবকদের নিরব দাওয়াতের সুবাদেই পৃথিবীর এই ভূখন্ডে ইসলামের সৌরভটুকু শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু প্রচার বিমুখ নৈশসাধক এসব সূফী বুযর্গের এমন কোনো উপায় উপকরণ ছিলনা যে গুলোর সাহায্যে এখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও তাহযীব তামাদ্দুনের বিস্তার ঘটতে পারে। তেমনি সরকারি সাহায্য ছাড়া ঐ সকল সূফী সাধকের একক প্রয়াসের দ্বারা ক্রম বর্ধমান মুসলমানদের বিদআত এবং শিরকি আকীদা বিশ্বাস ও নানান প্রকার জাহেলি রসম-রেওয়াজের হাত থেকে দূরে রাখাও সম্ভব ছিলনা। এ কারণে যারাই এসব সূফী বুযর্গের দাওয়াত ও সংশ্রবে ইসলাম কবুল করেছিলেন তারা সে সব সূফী বুযর্গের কবরসমূহকে মাযার ও উপাসনালয়ে পরিণত করে বসেন। এভাবে কবর কেন্দ্রিক এই ধর্মীয় মারকাযসমূহ যাবতীয় বিদআত, শিরক ও কুসংস্কারের আখড়ায় পরিণত হয়। আর এসব মারকায থেকেই ধর্ম পিপাসু আল্লাহর বান্দারা ইসলামের শিক্ষা লাভ করতে থাকেন।

গোমরাহির যুগ (৯৬৪-১০১৪ হিজরি)

হিজরি দশম শতাব্দী ও তার পূর্বে যেসব মুসলিম রাজা-বাদশা শাসন পরিচালনা করেছিলেন, তারা ইসলামের প্রতি কোনো প্রকার শত্রুতা পোষণ করেননি। বরং তাদের মধ্যে মুহাম্মদ তুঘলক এবং ফিরোজ তুঘলকের ন্যায় সৎ ও নিষ্ঠাবান রাজা-বাদশাও ছিলেন, যারা দীনের সেবায় এবং সমাজ সংশোধনে নিজেদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। শুরু থেকেই মোঘলদের ভূমিকা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির । তাদের পূর্ব পুরুষ তৈমুর লং অভিযানকালে হত্যা লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে কাফির ও মুসলিমের মধ্যেও কোনো তারতম্য করেনি। রাজ্যহারা হুমায়ূন নিজের হতাশাগ্রস্ত ভাগ্য বিড়ম্বিত ও অনিশ্চিত জীবনের এক পর্যায়ে নিজের আশ্রয়স্থল ইরান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেও সাথে করে এমনসব জিনিসই নিয়ে আসলেন যা পরবর্তীতে ইসলামী ভারতের জন্যে এক জটিল ও স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যে মোঘল বাদশাহর আমলে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে আল্লাহর বিশাল বিস্তৃত ভূখন্ডকে সংকোচন করার অপচেষ্টাচালানো হয় এবং ইসলাম, ইসলামী নিদর্শনসমূহ ও ইসলামী মূল্যবোধের চরম অবমাননা করা হয়,তিনি ছিলেন সম্রাট আকবর।

এই স্বল্প বয়স্ক অনভিজ্ঞ এবং নিরক্ষর বাদশা ৯৬৪ হিজরিতে উত্তরাধিকার সূত্রে শাসন ক্ষমতায় সমাসীন হন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরকাল এই উপমহাদেশ শাসন করেন। এক সময় কোনো শয়তান এসে তার কানে কানে বলে : আরবি নবীর আর্বিভাবের পর এখন হাজার বছর চলছে। দ্বিতীয় হাজার বছরে

www.pathagar.com

এখন নতুন দীন বা নতুন ধর্মের প্রয়োজন । ঐ সনাতন ধর্ম এখন অচল। এটি আর এখন চলতে পারে না।'- এই কুপরামর্শটি নিরক্ষর বাদশা আকবরের অন্তরে যাদুমন্ত্রের ন্যায় কাজ করলো। তার গুমরাহ উপদেষ্টা পরিষদ ও দরবারি চাটুকরদের ষড়যন্ত্রে 'দীন-এ এলাহী' নামক এক নতুন ধর্মমতের উদ্ভব ঘটলো। সম্রাট আকবরের সমীপে রাজকীয় সভাসদদের পক্ষ থেকে তাদের স্বাক্ষরযুক্ত এক সুপারিশ ও আবেদনপত্র পেশ করা হলো (৯৮৭ হিঃ)। উক্ত সম্মিলিত আবেদন পত্রের সারমর্ম হলো- মহামান্য সম্রাটের উপাধি হবে 'যিল্লুল্লাহ' (আল্লার ছায়া) এবং 'ইমামে আদিল' (ন্যায় পরায়ণ শাসক) ও 'মুজতাহিদুল আছর' (যুগের মুজতাহিদ)। অর্থাৎ তিনি আল্লাহর ছায়া, ন্যায় বিচারক নেতা ও যুগের মুজতাহিদ, যিনি জবাবদিহির উর্ধ্বে এবং কোনো ব্যাপারে তিনি কারও অধীনস্থ নন। তাঁর হুকুম নির্দেশ সকল সমালোচনার উর্ধ্বে। মোটকথা, রাষ্ট্রীয় সভাসদরা সম্রাট আকবরকে নিষ্পাপ-নিরাপরাধ হবার মস্ত বড় সনদ দিয়ে দেন।

অতপর এই অধিকার বলে সম্রাট আকবর র্মের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা চালাতে এবং খেয়াল খুশিমতো যা ইচ্ছা তাই করতে শুরু করলেন। উদয়মান সূর্য এবং আগুনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাবনত শিরে প্রণাম করার অভিযোগও তার বিরুদ্ধে রয়েছে। সম্রাট আকবর কর্তৃক হযরত মরিয়ম (আ) কে- উপাস্য বানানো এবং নক্ষত্র পূজা করারও অভিযোগ আছে। তিনি নিজ জ্ঞান বুদ্ধিকে চূড়ান্ত এবং ত্রুটিমুক্ত মনে করতে শুরু করেছিলেন ।

এই বিকৃত চিন্তা ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার সাথে সাথে ইসলাম, ইসলামী নিদর্শন ও ইসলামী মূল্যবোধ সমূহের প্রতিও তার ঘৃণা- অবজ্ঞা সীমাহীনভাবে বেড়ে গিয়েছিল। নবুওয়াতের মর্যাদাকে খাটো করে দেখাবার জন্য তিনি চাকর নফরদেরকে অবজ্ঞার সুরে 'মুহাম্মদ' এবং 'আহমদ' নামে সম্বোধন করতেন (নাউযুবিল্লাহ)। হিজরি পঞ্জিকার পরিবর্তে এলাহী পঞ্জিকা প্রচলন করেন। উক্ত পঞ্জিকায় বছর গণনা শুরু হয় সম্রাট আকবরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার সন থেকে। মদ্যপান এবং জুয়া খেলাকে খোলাখুলি বৈধ বলার দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা প্রদর্শনের মূল প্রেরণাও ছিলো আকবরেরই মস্তিষ্ক প্রসূত। গরু যবেহ করাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। তার আমলে বহু মসজিদ ধ্বংস করা হয়। অপরদিকে শাহী দরবারে তার অমুসলিম স্ত্রীদের প্রভাবে হিন্দু সংস্কৃতি ও আচার বিধির প্রাধান্য বেড়ে যায়। অমুসলিম স্ত্রীদের জন্য শাহীখানায় নির্দিষ্ট উপাসনা কক্ষ নির্মাণ করা হয়। সেখানে মুর্তি পূজার যথারীতি ব্যবস্থা করা হয়। হিন্দুদের বিভিন্ন তেহার ও পূজা-পার্বন উপলক্ষে ব্যাপক আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হতো।

www.pathagar.com

সার কথা, আকবরের আমলে গোটা শাহী মহলের পরিবেশে হিন্দুয়ানি নিয়মনীতি, আচার বিধি ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি প্রাধান্য বিস্তার করে। আসলে সম্রাট আকবর ধর্মীয় ব্যাপারে যে ফিৎনা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে গেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে এই ক্ষুদ্র পরিসরে তা সম্ভব নয়। এ জন্যে দীর্ঘ পরিসরের একটি বই রচনা করা দরকার। এই সংক্ষিপ্ত লেখায় শুধু এ ব্যাপারে মোটামুটি একটি ইঙ্গিত দেয়া যেতে পারে।

অবশ্য একটি জরুরি বিষয় এ ক্ষেত্রে না বললেই নয়। তাহলো ধর্মীয় ব্যাপারে এই বিভ্রান্তি ও বিকৃতির বড় নিমিত্ত হিসাবে কাজ করছে এক শ্রেণীর অসাধু আলেম। আলেমদের ধন-সম্পদ, আরাম, পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সম্পদ স্বার্থের সীমাহীন লোভ, উপরন্ত দীনের দাবি সম্পর্কে চিন্তার অগভীরতা আকবরি বিভ্রান্তিতে আগুনে ঘৃতাহুতির কাজ করে। উক্ত অসাধু আলেম শ্রেণীর সত্যকথা বলার ব্যাপারে সৎ সাহসের অভাব, ভীরুতা আর স্বার্থপরতার পরিণতি এই দাঁড়ালো যে, তারা সম্রাট আকবরের হাতে ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপের স্বাধীনতা দিয়ে দিলো। তাদের সম্মিলিত স্বাক্ষরযুক্ত সেই সুপারিশনামাটি হয়ে দাড়াঁলো ইসলামের জন্যে কতলনামা। কাজেই একথা বলাটা কিছুতেই অসঙ্গতি বা অত্যুক্তি হবেনা যে, সম্রাট আকবরের ধর্মীয় ব্যাপারে সৃষ্ট বিভ্রান্তির উদ্ভাবন ও তার লালনে তৎকালীন এক শ্রেণীর স্বার্থপর ও চাটুকার আলেমের ভূমিকা ছিলো বিরাট। আকবরের যুগের ইবনে হাম্বল তথা সৎ সাহসী সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব হযরত মোজাদ্দিদে আলফেসানি (র) যথার্থ মন্তব্যই করেছেন যেঃ সে যুগে দীন ও মিল্লাতের জন্য ক্ষতিকর যতো ফতোয়া প্রকাশ করা হয়েছিল তা সবই ছিলো হতভাগা অসাধু আলেমদের পক্ষ থেকে। মূলত তারা ছিলো নরাধম ও দস্যু। অর্থ্যাৎ- তারা ছিলো শয়তানের দলভুক্ত। সাবধান শয়তানের দলই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"

মুজাদ্দিদ আলফেসানি (র) [৯৭৭-১০৩৪হিঃ]

আমরা এখন ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী ইতিহাসের সেই পর্যায় আলোচনা করবো, যেখান থেকে এদেশে সঠিক ইসলামী নেতৃত্বের সূচনা ঘটেছিল। প্রচন্ড খরায় জমি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেই আল্লাহর রহমতের বারিধারা বর্ষিত হতে থাকে। তদ্রুপ সম্রাট আকবরের সৃষ্ট ধর্মীয় ফেতনা ও বিভ্রান্তি যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং খাঁটি মুসলমানদের উপর চলতে থাকে সরকারি যুলুম নিপীড়ন, ঠিক তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই ভূখন্ডে এক দরবেশকে সংস্কারকের ভূমিকা পালনের তৌফিক দান করেন। দেব-দেবী পূজার এই ভূখন্ডে সর্বপ্রথম তিনিই ইসলামের সঠিক নেতৃত্বের পতাকা উড্ডীন করেন।

www.pathagar.com

শিরক, বিদআত, কুফর ও যাবতীয় কুসংস্কারের প্রচন্ড তুফানের মাঝে তিনি কুরআন- সুন্নাহর সঠিক শিক্ষার মশাল প্রজ্জলিত করেন। নির্ভেজাল তাওহীদ তথা একত্ববাদের আওয়াজ বুলন্দ করেন। বিশেষত তিনি সর্বোত্তম সংগ্রাম 'আফযালুল জিহাদ' এর আদর্শকে পুণরুজ্জীবিত করেন।

আপনারা কি জানেন সেই মহান সংগ্রামী দরবেশ সংস্কারক কে ছিলেন? তিনিই ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের নির্ভীক ব্যক্তিত্ব বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর আহমদ ইবনে আবদুল আহাদ ফারূকী সরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানি (র.)। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন মুজাদ্দিদের মর্যাদার অধিকারী। শহীদে কারবালা ইমাম হোসাইন (রা), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র) নিজ নিজ স্থানে ইসলামের অস্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষায় যে ত্যাগদীপ্ত অবদান রেখে গেছেন, মূলত সেই মহান দায়িত্বই এই উপমহাদেশে আমল করে গেছেন সংগ্রামী সূফী সাধক হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি (র)। মাদুরে বসা এই মহান সাধক দরবেশ এমন ঈমানদীপ্ত নির্ভীকতা এবং আল্লাহ প্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন যা আবহমান কাল থেকে দেখিয়ে এসেছেন আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রত্যাশী মহা পুরুষরা।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি (র) বেড়ে উঠেন হিজরি দশম শতাব্দীর শেষের দিনগুলোতে। তিনি যৌবনে পদার্পন করেই সম্রাট আকবর কর্তৃক ধর্মীয় ব্যাপারে বিকৃতি সাধনের এই ফিতনার ভয়াবহ পরিণতি আঁচ করতে পারেন। আকবরি ফিতনা প্রতিরোধের জন্যে তিনি মানসিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন। নিকট ও দূরবর্তী এলাকায় দেশের সর্বত্র জালের ন্যায় তাঁর শিষ্য সংখ্যা বিস্তার লাভ করে। তিনি উচ্চ সরকারি কর্মচারি এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপকভাবে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচার করতে লাগলেন। তবে তাঁর ইসলামী আন্দোলনের কর্মী তৈরির এই দাওয়াতী কাজের প্রভাব প্রকাশ পায় সম্রাট আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের শাসনামলে। ঐ সময় আকবরের ধর্ম বিকৃতির অপকর্মের কুফলসমূহ পূর্ণ মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি (র) তখন আর খানকায় বসে না থেকে সম্পূর্ণ খোলা ময়দানে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রকাশ্যে আকবরি ফিতনা ও দীনে এলাহীর সৃষ্ট অপকর্মসমূহের বিরুদ্ধে কথা বলতে থাকেন। দুর্বার আন্দোলনের ফলে ঐ ফিৎনা এবং ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারনা থেকে সৃষ্ট যাবতীয় বিদআত, শিরক ও কুসংস্কার উৎখাতে তিনি বহুলাংশে সফলকাম হন। অসংখ্য মানুষ দলে দলে এসে তাঁর আন্দোলনে শরীক হয়।

www.pathagar.com

প্রথম দিকে সরকার তাঁর বিরুদ্ধে তেমন কঠোরতা দেখায়নি। কিন্তু তাঁর উচ্চারিত সত্যের আওয়াজ যখন অধিক বুলন্দ হয়ে উঠলো, অন্যদিকে আকবরি ফিৎনার সাথে জড়িত স্বার্থপর কুচক্রি মহলও নানান বিভ্রান্তিমুলক কথাবার্তা দ্বারা সম্রাটের কানভারি করতে লাগলো, তখনই সরকার মুজাদ্দিদে আলফেসানির আন্দোলনে সন্দেহপরায়ণ হয়ে উঠে। বিশেষ করে এই আন্দোলন এবং এর সাথে দলে দলে সমাজের সকল স্তরের মানুষের যোগদান ক্ষমতাসীন মহলকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে। হযরত মুজাদ্দিদকে শাহী ফরমান জারি করে দরবারে তলব করা হয়। আল্লাহর পথের এই সংগ্রামী মুজাদ্দিদ শাহী দরবারেও নিজের দীনি কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন। শাহী দরবারের ইসলাম বিরোধী প্রচলিত শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। মানুষ মানুষকে সিজদা করবে, তাওহীদে বিশ্বাসী একজন মুসলমান এই শেরকি দৃশ্য কি করে বরদাস্ত করতে পারে? সুতরাং আল্লাহর পথের নির্ভীক সিপাহ্সালার ঈমানদীপ্ত হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি(র) প্রকাশ্যে দরবারে এই গর্হিত কাজের নিন্দা করেন। বৈষয়িক শৌর্যবীর্যের গর্বে গর্বিত একটি শাহী দরবারে প্রত্যক্ষভাবে সরকারের এহেন নিন্দা সমালোচনার পরিণতি কি হতে পারে তা স্পষ্ট। সুতরাং যা হবার তাই হলো, হযরত মুজাদ্দিদ (র) কে গোয়ালিয়র দূর্গে কারারুদ্ধ করা হলো।

কিন্তু আগুন কি কখনো তুলা ছাপা দিয়ে রাখা যায়? সত্যের এই নির্ভীক মুজাহিদ কারাগারেও নিজ দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন। অল্প দিনের মধ্যেই কারা পরিবেশের রূপ বদলে যায়। কারাগারস্থ সকল কয়েদী মুজাদ্দিদে আলফেসানি (র) এর অনুসারী হয়ে যায়। সকলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই পরিস্থিতি অবহিত হয়ে সম্রাট ও তার সভাসদরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। বাদশাহ হযরত মুজাদ্দিদ (র) কে সম্মানিত ভাষায় রাষ্ট্রীয় অতিথি রূপে দাওয়াত প্রদান করেন । খোদ সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা দিয়ে আনেন। যুগ সংস্কারক মুজাদ্দিদে আলফেসানি (র) রাজনৈতিক এই অনুকূল অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। তিনি সম্রাটকে পরামর্শ দিয়ে আকবরি শাসনামলের সকল শিরক, বিদআত, যাবতীয় কুসংস্কার ও গর্হিত রীতিনিয়ম নিষিদ্ধ করান। এভাবে এক নির্ভীক খোদাপ্রেমিকের ঈমানী চেতনা দ্বারা উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় আকাশকে আচ্ছন্নকারী ঘোরতমসা কেটে যায়। অতপর এখানে পুনরায় ইসলাম তার মর্যাদার শির উঁচু করে দাঁড়ায় । হযরত মুজাদ্দিদ (র) তাঁর সংস্কারমূলক কাজ ও ইসলামী আন্দোলনের জন্যে চারটি জিনিসের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্যারোপ করেন । সেগুলো হলো ঃ

www.pathagar.com

১. সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় প্রশাসক ও কর্মকর্তাদের সংশোধনের প্রতি তিনি মনোযোগী হন। কারণ এ শ্রেণীর লোকদের অন্তরে ইসলামের দাওয়াত সাড়া জাগাতে সক্ষম হলে গোটা জাতি ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়া কঠিন কোনো ব্যাপার হয়না। তাঁর এ পদ্ধতি বহুলাংশে সফল হয়।

২. তিনি অনুভব করেন আজকের যুগে ইসলাম যেসব বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং সামনে যেসব বিপর্যয় আসন্ন, তার জন্যে একশ্রেণীর অসাধু আলেমের দুর্বলতা, স্বার্থপরতা, আত্মকলহ ও সৎসাহসহীনতাই দায়ী। কাজেই ইসলামের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী এসমস্ত আলেমের স্বরূপ উদঘাটন ও তাদের তীব্র সমালোচনা করতে তিনি আদৌ দ্বিধা করেননি। এই কর্মনীতির বিরাট সুফল পাওয়া যায়।

৩. তিনি আরও অনুভব করেন, তাঁর সমসাময়িক সূফী দরবেশগণ অধিকাংশ বেদান্ত দর্শন এবং হিন্দুযোগীদের আত্মসাধনার পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত। তাদের বিরাট একটি অংশ সর্বেশ্বরবাদের আকীদা বিশ্বাসের সমর্থক ছিলো। হযরত মুজাদ্দিদ (র) এ সমস্ত বে-এলেম অজ্ঞ সূফী দরবেশ এবং তাদের গোমরাহ আকীদা-বিশ্বাস ও মতবাদের প্রচন্ড বিরোধিতা করেন। এটা তাঁর এমন একটি অবদান যা সেকালের ইসলামী ভারতে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির ক্ষেত্রে তাঁকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে সমাসীন করে।

৪. দীর্ঘকাল থেকে একশ্রেণীর স্বল্প শিক্ষিত ওয়ায়েয এবং পীর মাশায়েখের এই অভ্যাস ছিলো, যখনই কোনো বিদআতের ব্যাপারে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতো, তাঁরা একে বিদআতে হাসানা বলে বহাল রাখার চেষ্টা করতেন। সম্ভবত ইসলামী ভারতে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি (র) প্রথম ইসলামী ব্যক্তিত্ব যিনি এর মন্দ দিকের স্বরূপ উন্মোচন করেন। তিনি তার মাকতুবাত গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় বার বার একথা বর্ণনা করেছেন যে, বিদআত তো বিদআতই, একে ভালো এবং মন্দে ভাগ করা যায় না। বিদআত বলতেই বিপথে পরিচালনাকারী। এর পরে হাসানা এবং সাইয়েয়ার প্রশ্ন কেন? মুজাদ্দিদে আলফেসানি (র) এর এই অবদানও অসামান্য। বিশেষ করে অনেক বড় বড় আলেম যেখানে বিদআতে হাসানার তাৎপর্য অনুধাবনের ব্যাপারে হোঁচট খেয়েছেন, তা দেখেও হযরত মুজাদ্দিদ (র) এর এই অবদানের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। ওয়াহদাতুল ওজুদ বা সর্বেশ্বরবাদের তীব্র প্রতিবাদ এবং বিদআতে হাসানার স্বরূপ উদঘাটন হযরত মুজাদ্দিদ (র) এর এমন একটি কীর্তি যা শুধু এককালের ইসলামী ভারতেই নয় বরং সমগ্র ইসলামী চিন্তা জগতের ইতিহাসে তাকে একটি বিশেষ উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছে।

www.pathagar.com

শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) [৯৫৮-১০৫২হিঃ]

মুজাদ্দিদে আলফেসানি (র) - এর সংস্কারমূলক বহু গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও কীর্তির পাশাপাশি তাঁর সমসাময়িক ইসলামী বিশেষজ্ঞ আলেম স্বনামধন্য শায়েখ আবদুল হক(র)-এর আলোচনাও একান্ত জরুরি। শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী(র) - এর দ্বারা উত্তর ভারতে হাদীস শাস্ত্রের চর্চা বৃদ্ধি পায়। নবী জীবনের সুন্নত-আদর্শের ব্যাপক চর্চা হতে থাকে। আমাদের দৃষ্টিতে ইলমে হাদীস শিক্ষাদান ও বিস্তারের মহান খেদমত ও দৈনন্দিন অনুশীলনের কাজটি মানুষকে দীনের প্রাণ সত্তা ও প্রকৃতির দিকে আকর্ষণকারী এক মহান কাজ। শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর নিজ জীবনের সিংহভাগই ব্যয় করেছেন নবী (স)-এর জীবনাদর্শ প্রচারের মহান খেদমতে। ইসলামী জ্ঞান বিতরণের দিক থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত হস্ত। তাঁর এই মহান অবদানকে আমরা কখনও ভুলতে পারিনা। অস্বীকার করার তো প্রশ্নই উঠেনা। তাঁর এই মূল্যবান ইল্‌মী অবদান ও ধর্মীয় সেবাকর্মের প্রতি আমরা জানাই নিজেদের আন্তরিক গভীর সমর্থন।

সম্রাট আওরঙ্গযেব আলমগীর (১০৬৮-১১১৮হি)

সম্রাট আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের (১০৩৭হি) শাসনামলের শেষ পর্যায় থেকেই মোগল শাসন প্রণালীতে পরিবর্তনের সূচনা হতে থাকে। সম্রাট শাহজাহানের (১০৩৭- ১০৬২হিঃ) শাসনকালে এই পরিবর্তন আরও অধিক স্পষ্ট হয়ে উঠে। সভ্যতা সংস্কৃতির কাঠামোতে রূপান্তর ঘটতে থাকে। শাহী দরবারের প্রচলিত নিয়ম-নীতি, আদব কায়দা ও শিষ্টাচারে রদবদল ঘটে। তবে সম্রাট আকবর ও তার সভাসদবর্গ বছরের পর বছর ধরে ইসলামের দৃষ্টিতে বিকৃত ও গর্হিত যে সমস্ত নিয়মনীতি লালন করে আসছিল এবং ঐগুলোর প্রভাবে সৃষ্ট যেসব নৈতিক ও চারিত্রিক ব্যাধি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, তার মূলোৎপাটন কল্পে দৃঢ়চেতা প্রতিভাদীপ্ত এক শাসকের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। আল্লাহর লাখো শুকরিয়া, সহজ, সরল অনাড়ম্বর জীবনের অধিকারী মহান সম্রাট আওরঙ্গযেব আলমগীরের শাসন মসনদে বসার মধ্য দিয়ে সেই অভাব দূরীভূত হয়। বাদশাহ আওরঙ্গযেব আলমগীরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় এক ধারাবাহিক জিহাদের দৃঢ় সংকল্প এবং এক অসমাপ্ত সংগ্রামের সূচনা হয়। আপন ভ্রাতা দারাশিকোর সঙ্গে সম্রাট আওরঙ্গযেবের যুদ্ধ নিছক দুই প্রতিদ্বন্দী

www.pathagar.com

ভাইয়ের মধ্যকার যুদ্ধ ছিলনা। বরং এটি ছিলো দু'টি পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভংগি ও মতবাদের যুদ্ধ। একজন চেয়েছিলেন তাঁর প্রপিতাসহ সম্রাট আকবরের তথাকথিত দীনে এলাহী নামক মতবাদকে পুনরুজ্জীবিত করতে। অপরজন চেয়েছিলেন আপন প্রিয় পয়গাম্বর মানবতার মুক্তির দিশারী নবী মোস্তফা (স)-এর আদর্শকে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে। প্রকৃত কথা এই যে, ইসলামী ভারতের কোনো ইতিহাসই উক্ত মহান শাসকের মহান উজ্জল কৃতিসমূহ ব্যতিরেকে পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব নয়। তুঘলুক বংশের কতিপয় শাসকের কথা বাদ দিলে ইনিই ছিলেন এই উপমহাদেশের একমাত্র প্রথম ও শেষ বাদশাহ, যিনি মূর্তি ও দেবদেবীর এই বিশাল ভূমিতে আল্লাহর অনুমোদিত সত্য জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামের ভিত্তি ও অবকাঠামো সমূহ মজবুত করেছিলেন। কুফর, শিরক, বিদআত ও যাবতীয় কুসংস্কারের মিশন ও আবিলতা থেকে তিনি ইসলামকে পবিত্র করেছিলেন। রাষ্ট্র ও সরকারের গোটা প্রশাসন ব্যবস্থায় তিনি পূর্ণ ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় ছিলেন সচেষ্ট।

উপমহাদেশে তখনকার মুসলিম শাসনামলে যে শাসন পদ্ধতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু ছিলো, এখানে সে ব্যাপারেও কিছুটা আলোকপাত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বলা বাহুল্য, তখন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রাজতান্ত্রিক বাদশাহী প্রভাবই সর্বত্র চালু ছিলো। রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব থাকতো এক ব্যক্তির হাতে। তার অঙ্গুলি হেলনেই সব কিছু চলতো। এদিক থেকে এসব শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থা বলা যায় না। তবে,এই শাসকদের ব্যক্তিগত খোদাভীতি, তাকওয়া, পরহেযগারী ও দায়িত্ববোধই তাদেরকে অনৈসলামিক ক্রিয়াকান্ড থেকে বিরত রাখতো। দেশ ও সমাজে ইসলামী আইন কানুন জারির ব্যাপারে তাদের বিবেকবোধ তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতো।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী র. (১১১৪- ১১৭৪ হি.)

এবার আমরা দ্বাদশ হিজরির সীমানায় প্রবেশ করছি। ১১১৮ হিজরিতে সম্রাট আওরঙ্গযেব আলমগীরের ইন্তেকাল হয়। উপমহাদেশে তিনি যেমন সকল দিক থেকে মুসলিম মিল্লাতের গৌরব রক্ষাকারী মহান সম্রাট। তেমনি তার সম্পূর্ণ বিপরীত তার স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা ছিলেন একেবারে অথর্ব দুর্বল। ফলে অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই দেখতে দেখতে মোগল শাসনের সকল শৌর্যবীর্যের অবসান ঘটে। রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি ও আইন শৃঙ্খলার সকল বাধন দুর্বল হয়ে পড়ে। গোটা ভারতের সর্বত্র বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

www.pathagar.com

দেশের প্রতিটি রাজ্য ও প্রদেশের শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশের স্থানীয় রাজনৈতিক শক্তিসমূহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এ সমস্ত রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি আশ্রিত ডুব দিয়ে থাকা বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলোও নাক জাগাতে শুরু করে। সম্রাট আওরঙ্গযেবের শাসনামলে যে সমস্ত শিরক, বিদআত ও কুসংস্কার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল সেগুলোও আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করলো। শেষ দুর্বল মোগল সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় শী'আ মতবাদও পুনরায় উপমহাদেশে মাথা তুলতে থাকে। সাধারণ মুসলমানদের দীনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি যেমন পূর্বেও যথোপযুক্ত দৃষ্টিদান করা হয়নি, পরবর্তীতেও তথৈবচ অবস্থা। গোটা জাতিই রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসক ও কর্মকর্তাদের অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতো। অতপর যখনই রাষ্ট্রীয় কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়লো জনগণ তখন চোখে শর্ষে ফুল দেখতে লাগলো। তারা অনিশ্চয়তার অন্ধকারের সম্মুখীন হলো। ধর্মীয় ওলামা, সূফী সাধকদের ভূমিকায়ও বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখা গেলনা। মাদ্রাসার শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা সেই সাবেক ধাঁচেই চলতে থাকলো। কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা আদর্শের চর্চা ও তার গভীরে গিয়ে গবেষণা ইত্যাদির ব্যাপারে উদাসীনতা আগের মতোই থেকে গেল। মোট কথা, একদিকে ছিলো ছয় সাতশ' বছরের চলে আসা ত্রুটি- বিচ্যুতিসমূহ, অপর দিকে সেগুলোর অপসারণ কল্পে চলছিল এক সূফী সাধক ও এক শাহেনশাহের প্রচেষ্টা। সম্রাট আওরঙ্গযেবের উত্তরাধিকারীরা যদি যোগ্য প্রজ্ঞাশীল ও সচেতন হতেন, তা হলে হয়তো সংস্কারধর্মী কর্মধারা অব্যাহত থাকতো। কিন্তু তাদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার কারণে গোটা পরিস্থিতিই বদলে গেল। অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকলো। অতপর দেখা দিলো আরেক মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকের তীব্র প্রয়োজনীয়তা। ঠিক এমন এক পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যেই জন্ম নিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র)। বয়োপ্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নতুন করে সংস্কারমূলক কাজের সূচনা করলেন। তাঁর সামনে ছিলো ইসলামের পুরো জীবন ব্যবস্থা। তিনি এর সকল দিক ও বিভাগেরই উন্নতি অগ্রগতি সাধনে প্রয়াসী হলেন। প্রথমে গোটা ইসলামী ইতিহাসের তিনি পর্যালোচনা করেন। তাঁর মিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলো অনৈসলামী চিন্তাভাবধারার সমালোচনা করা। এই বিরাট কাজের জন্যে যে জ্ঞানগত যোগ্যতা, দৃঢ়তা ও সাহসের প্রয়োজন ছিলো, তাঁর মধ্যে সেগুলো পুরোমাত্রাই ছিলো। আমরা এখানে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী র.-এর অবদানসমূহের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

www.pathagar.com

১. মোগল সম্রাট হুমায়ুনের শাসনকাল থেকেই মোগল সাম্রাজ্যে শী'য়া মতবাদের প্রচার জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। তা দিনের পর দিন বেড়েই চলে। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী র. 'ইযালাতুল খিফা' গ্রন্থ লিখে এ ব্যাপারে বাস্তব চূড়ান্ত আলোচনা করেন। তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সমূহও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

২. তখনো পর্যন্ত উলামায়ে কিরাম ইলমুল কালাম তথা ধর্মীয় বিষয়সমূহ দলিল ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রমাণিত করাকেই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ মনে করতেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী র. হাদীস শাস্ত্র ও ফেকাহ শাস্ত্রের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শরীয়তের বিধান সমূহের কারণ ও যৌক্তিক রহস্যসমূহ নিয়ে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' গ্রন্থটি রচনা করে তাদের দৃষ্টিভংগি সংশোধনের চেষ্টা করেন।

৩. হিজরি দ্বাদশ শতকের পূর্বে হিমালয়ান উপমহাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ইলমী ও ধর্মীয় বিভিন্ন মহলে কুরআন মজীদের শিক্ষা রীতিমতো পাঠ্য তালিকার বাইরে ছিলো। তখন এই মহামনীষী অসূলে তাফসীর তথা কুরআন মজিদের তাফসীরের ব্যাখ্যা পদ্ধতির উপর 'আল ফওযুল কবীর' নামক একখানা অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এর মাধ্যমে তিনি দরসে কুরআন এবং কুরআন অধ্যয়নের ব্যাপারে সকলের প্রতি আহবান জানান। এই লক্ষ্যে তিনি তৎকালীন অবিভক্ত ভারতে প্রচলিত রাষ্ট্র ভাষা ফারসিতে কুরআন মজিদের তরজমা করেন। এভাবে মহান ইসলামী চিন্তাবিদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী র. সাধারণ মানুষের জন্যে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন এবং এর মর্মবাণী অনুধাবনের একটি সহজ পথ খুলে দেন ।

৪. ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে যাবতীয় গোঁড়ামি ও স্থবিরতার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেন। কুরআন হাদীসের গবেষণা এবং এগুলোর মর্মার্থ নিয়ে ইজতিহাদ বা উদ্ভাবনী জ্ঞান অনুশীলনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি নতুন উদ্ভাবিত সমস্যাবলীর সমাধানে ইসলামের মৌলবিধান থেকে উদ্ভাবনকারী 'মুজতাহিদ'গণের পারস্পরিক মতপার্থক্যের উপরও যুক্তিগ্রাহ্যভাবে আলোকপাত করেন। ইসলামী আইনবিদ, ইমাম, ফকীহ-মুজতাহিদদের পরস্পর বিরোধী মতামতের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সামঞ্জস্য বিধানেরও তিনি চেষ্টা করেন। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ' এবং 'আল ইনসাফ ফী বায়ানে আস্‌বাবিল ইখতেলাফ' গ্রন্থদ্বয়ে তিনি এ প্রসঙ্গে বিশেষ আলোচনা করেন।

www.pathagar.com

এই মূল্যবান গ্রন্থ দু'টি[১] পাঠে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই যে কারও মন কুরআন ও সুন্নাহর অন্তরনিহিত ভাবার্থ জানার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠে। অন্ধ-অনুসরণের বদলে মূল বিষয়বস্তুর ব্যাপক জ্ঞান লাভে আগ্রহ জাগে।

৫. মহানবী (স) এর পবিত্র বাণী হাদীস শরীফের বিশাল জ্ঞান-ভান্ডারের সঙ্গে সকলকে পরিচিত করার লক্ষ্যে হাদীস শিক্ষার প্রসারে তিনি বিরাট অবদান রেখে যান। এজন্যে তিনি জীবনের বৃহদাংশ ব্যয় করেন। বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ মুআত্তা-এ-ইমাম মালিক এর তিনি দুটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। একটি আরবি ভাষায়, অপরটি ফারসি ভাষায়। এই সঙ্গে অন্যান্য ছোট খাটো বহু মূল্যবান কিতাব রচনা ছাড়াও শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী তাঁর অবর্তমানে আপন যোগ্য শাগরীদদের এক বিরাট ধারাবাহিকতা রেখে যান। সেসব মহান ব্যক্তিদের নিষ্ঠাপূর্ণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সাধনার ফলে উপমহাদেশের প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত হাদীস শাস্ত্রের চর্চা হতে থাকে এবং সর্বত্র 'হাদ্দাসানা' এবং 'আখবারানা' -এর গুঞ্জরণ ধ্বনিত হতে থাকে ।

শাহ্ ওয়ালিউল্লার সন্তান ও শিষ্য শাগরিদ

মনীষী শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর বড় সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে এমন সব সুযোগ্য সন্তান ও শিষ্য শাগরিদ দান করেছিলেন, যাঁরা এই মনীষীর তিরোধানের পরও তার মিশনকে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এর পরিপূর্ণতা বিধানে অধিক তৎপর ছিলেন। একদিকে তাঁর শিক্ষা প্রশিক্ষণে প্রভাবিত ও প্রশিক্ষিত হয়ে,অপরদিকে তাঁর বংশ থেকেও এমনসব ত্যাগী মুজাহিদ জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁরা আল্লাহর রাহে নিজেদের জীবনকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর স্বনামধন্য চার সন্তান ১. শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (মৃত্যু ১২৩৯ হিজরি), ২. শাহ রফীউদ্দীন (মৃত্যু ১২৩৩ হিজরি), ৩. শাহ আবদুল কাদির (মৃত্যু ১২৩০ হিজরি) এবং ৪. শাহ আবদুল গনি (মৃত্যু ১২২৭ হিজরি) সকলেই ছিলেন যুগের অনন্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের সাধারণ ও বিশিষ্ট সকল শ্রেণীর মানুষের শ্রদ্ধাভাজন। তাঁদের অকান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা সাধনার বদৌলতেই গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা- আদর্শের ব্যাপক চর্চা

১ শেষোক্ত গ্রন্থটি 'মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পথা অবলম্বনের উপায়' নামে মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম কর্তৃক অনূদিত এবং বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

হয়। তাঁদের রচিত মূল্যবান গ্রন্থাবলী ওলামা, তালাবা, সমাজের বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের কাছে প্রামাণ্য গ্রন্থ রূপে বিবেচিত। শাহ আবদুল কাদের (র) এর কুরআন তরজমা আজও আদর্শ অনুবাদ রূপে বিবেচিত এবং অতুলনীয়। এমনিভাবে তাঁর দৌহিত্র শাহ মুহাম্মদ ইসহাকও (মৃত্যু ১২৬২ হি) বিশেষ সময় পর্যন্ত শাহ ওয়ালিউল্লাহর ধর্মীয় অবদানের ঐতিহ্য বহাল রাখেন। এই মনীষীর জ্ঞান প্রজ্ঞার উৎসধারা থেকে আরব- অনারবের হাজারো জ্ঞান পিপাসু আপন তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহর সুযোগ্য সন্তানদের মধ্যে একমাত্র সর্বকনিষ্ট সন্তান শাহ আব্দুল গনি (র) যুব বয়সেই ইন্তেকাল করেন। একারণে তিনি তাঁর অন্যান্য ভাইদের মতো ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে অধিক কাজের অবকাশ পাননি । তবে মহান ক্ষমতাধর স্রষ্টার ইচ্ছা ও কর্মধারাই আলাদা। তাঁর ঔরস থেকেই যুগ শ্রেষ্ঠ অনন্য সংগ্রামী এক মুজাহিদের জন্ম হয়। তিনি পিতামহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন। তখনকার ইসলামী ভারতের ইতিহাসে এমন এক উজ্জল দৃষ্টান্ত রেখে যান, যার জ্যোতি উজ্জল্য কোনো দিনই ম্লান হবার নয় ।

শহীদানে বালাকোট

ইতোপূর্বেকার আলোচনায় এটা সকলের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে যে, তৎকালীন ইসলামী ভারতে ইসলামকে তার প্রাণসত্ত্বা ও শক্তি নিয়ে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে তার উপর কুসংস্কার, বিদআত ও শিরকের যেসব মরিচা ও শেওলা পড়েছিল এবং ইসলামী চিন্তার ক্ষেত্রে যে স্থবিরতা দেখা দিয়েছিল, সেগুলোর অপসারণে সংস্কারমূলক কাজের সূচনা ঘটে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানি র. থেকেই। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী র. আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে পরিপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও গবেষণাধর্মী এক সংস্কারকর্ম ও বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করেন। অবশ্য তিনি বিপ্লবের উদ্যোগতা হলেও নিজে সেই বিপ্লব সংঘটিত করার সুযোগ পাননি। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ধর্মীয় চিন্তার পরিশুদ্ধি সাধন এবং বিভিন্ন প্রচলিত ভ্রান্ত মতাদর্শ ও চিন্তাধারার সমালোচনায় অতিবাহিত হয়। এটি কোনো বিস্ময়কর ব্যাপার নয়, জাতিসমূহের ইতিহাসে এরূপ হয়েই আসছে।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর তিরোধানের স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর শিষ্যবর্গ এবং তাঁর বংশের মধ্যে এমন কতিপয় ব্যক্তি আল্লাহ সৃষ্টি করেন যাঁরা তার মিশনকে পরিপূর্ণতা দান করেন। ন্যায় ও সত্যের আওয়াজকে বুলন্দ করেন । এ উপমহাদেশে তাঁরাই সর্বপ্রথম 'ইকামতে দীন'-এর কাজ তথা খোদায়ী

www.pathagar.com

জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে জোরদার করেন। এখানে আমি সাইয়েদ আহমদ শহীদ ব্রেলভীর (১২০১-১২৪৬ হি.) এবং ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ তাঁর একনিষ্ঠ সাথী মাওলানা ইসলাঈল শহীদ- এর (১১৯৩ -১২৪৬ হি.) কথাই বলছি। বাস্তব কথা হলো, ন্যায় ও সত্য পথের মহা সম্মানিত এ দুই শহীদ এবং তাঁদের অনুসারীরাও এপথে নিজেদের বাড়িঘর প্রাণসম্পদ যথা সর্বস্ব উৎসর্গ করে উপমহাদেশে নতুন করে সাহাবায়ে কিরামের যুগের স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহর অবতীর্ণ জীবন ব্যবস্থাকে মানব সমাজে বিজয়ী করা এবং শরীয়তকে এ ভূ-পৃষ্ঠে চালু করাই ছিলো তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। এ সুমহান লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্যে তারাঁ সম্ভাব্য সকল প্রকার ত্যাগ ও কুরবানীর চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন। সুদূর বাংলা থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত এই উপমহাদেশের প্রতিটি প্রত্যন্ত ধূলিকণা তাদের সেই ত্যাগ ও কুরবানীর সাক্ষী হয়ে আছে। কালপরিক্রমার শত বিবর্তনও সত্যপথের এই শহীদদের ত্যাগদীপ্ত কীর্তিসমূহ মুছে ফেলতে পারবে না।

সেই জিহাদ ও সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তাঁদের সেই আন্দোলন ছিলো হিমালয়ান উপমহাদেশের প্রথম ইসলামী আন্দোলন। ইসলামের সঠিক লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সেই আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল এবং সত্যের সৈনিকরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিজ লক্ষ্যের উপর অটল ছিলেন। উক্ত ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের ফলশ্রুতি এবং তার পতাকাবাহীদের রক্তঝরা ত্যাগের বিনিময়ে তাওহীদ ও সুন্নতের মূল প্রাণসত্তা যে পরিচিতি ও ব্যাপকতা লাভ করে এবং বিদআত ও শিরক প্রভাবিত কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজ যেভাবে দূরীভূত হয় তার বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের অবকাশ এখানে নেই। সংক্ষেপে শুধু এটুকুই বলা যায় যে, আজ(বাংলা-পাক-ভারত) উপমহাদেশে ঈমান ও আমলের যে সম্পদ বিদ্যমান এটি একমাত্র ঐ সত্য পথের সংগ্রামী মুজাহিদদেরই অবদান। তাঁদের ইলম, আমল ও চেষ্টা সাধনারই উজ্জ্বল রবি-রশ্মি।

ঐতিহাসিক বালাকোট জিহাদে মুজাহিদ নেতাদের শাহাদাতের পর এই আন্দোলনের অবসান ঘটেছিল একথা ঠিক নয়। এটা স্পষ্ট কথা যে, সাইয়েদ আহমদ শহীদ ব্রেলভী র.-এর শাহাদাতের ঘটনা থেকে নিয়ে বিংশ শতকের শুরু পর্যন্ত তাঁর অনুসারী আন্দোলনের নেতাকর্মীরা সকলেই এই আন্দোলন নিয়ে তৎপর ছিলেন। ইংরেজ সেনা ও পুলিশ বাহিনীর যাবতীয় চ্যাঙ্গেজি জুলুম নিপীড়ণ সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্যে সক্রিয় ছিলেন।

www.pathagar.com

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব

সাইয়েদ আহমদ শহীদ ব্রেলভীর বালাকোট কেন্দ্রিক ইসলামী আন্দোলন তখনো দেশের ভিতরে বাইরে সুসংগঠিত ভাবে অব্যাহত। ঐ প্রেক্ষাপটেই ১৮৫৭ সালের রক্তাক্ত সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়। এই বিপ্লবই উপমহাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক গোটা কাঠামোকে বদলে দেয়। যেহেতু এ বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুসলমানরা। আর তাদের হাত থেকেই ইংরেজরা উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল, একারণে মুসলমানরাই ইংরেজ শাসকদের রোষানলের শিকারে পরিণত হয়। এই বিপ্লবের জন্যে মুসলমানদেরকে দায়ী করে বিদেশী ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী তাদেরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ সকল দিক থেকে নিশ্চিহ্ন করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। চরম জুলুম নিপীড়ণ চালিয়ে এবং সংকট সমস্যার আবর্তে মুসলমানদের ফেলে তারা ভারত উপমহাদেশের তাওহীদি জনতাকে নির্মূল করতে সচেষ্ট হয়।

ধর্মীয় দিক থেকে এই বিপ্লবের পরিণতি ভয়াবহ প্রমাণিত হয়। কারণ এখানকার যে মুসলমানদের জীবনধারা প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সকল সময় সরকারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও অবলম্বনে চলতো, যাদের শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণের ছিলনা কোনো প্রতিষ্ঠানিক নিয়ম ব্যবস্থা, তাদের দ্বারা প্রতিরোধের আশা করা ছিলো বৃথা। তাদের দায়দায়িত্ব যে বিত্তশালী শ্রেণীটির উপর ছিলো সেই শ্রেণীটির মৌলিক দুর্বলতাসমূহ বিগত শতকের সংঘাত-সংঘর্ষের সময় পুরোমাত্রায় প্রকাশ হয়ে পড়ে। কাজেই কোনো বিদ্রোহ এবং তার ভয়াবহ পরিনাম যা দাঁড়াবে সাহসিকতার সঙ্গে সেই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার প্রত্যাশা তাদের থেকে কি করে করা যেতে পারে? অতএব ফল যা হবার তাই হয়েছে। চরম এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে থেকেই একদল মত প্রকাশ করতে থাকলো যে, বিরোধিতা নয়- 'চলো তোম ওধার কো - হাওয়া হো যে ধারকী.....।' 'হাওয়ার অনুকূল গতিতেই এখন মুসলমানদের চলতে হবে'- ইংরেজ তোষণমূলক এ শ্লোগান শেষ পর্যন্ত জীবনের কোনো অংশে সীমিত থাকেনি। বরং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষা প্রশিক্ষণ থেকে নিয়ে ধর্ম-নৈতিকতা সকল কিছু এ দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় এসে যায়। আমি শুধু এখানে ধর্মীয় চিন্তার উপরই আলোচনা সীমিত রাখবো।

স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ও তার সহগামীরা এ ব্যাপারে যেই ভুলটি করলেন আজ পর্যন্ত তার সংশোধন হয়নি। রাজনৈতিক প্রভাব ও ভীতি তার মনমস্তিষ্ককে এতই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে, তিনি প্রতিটি বিষয়কেই পরাজিতের মন নিয়ে

www.pathagar.com

দেখতে শুরু করলেন। তাঁর যাবতীয় লেখা, বক্তৃতা সকল কিছুর মধ্য দিয়ে ধর্মের ব্যাপারে এক পরাজিত মনের সুর বেজে উঠে। তার এই পতিত মানসিকতার প্রভাব কোনো না কোনো ভাবে এখনও একশ্রেণীর লোকের মধ্যে সক্রিয় রয়েছে। সাইয়েদ আহমদ খান তাঁর মিশনকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়ার লক্ষে 'মোহামেডান এংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। অপরদিকে এই পতিত মানসিকতা প্রতিরোধের লক্ষে দেওবন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় । আলীগড় ও দেওবন্দ শুধুমাত্র দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না। বরঞ্চ দুটি বিপরীত ধর্মী ও ভিন্ন গোলামী চিন্তাধারার স্বতন্ত্র কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল । প্রথমটি যদি এ কাজ করে মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেও থাকে, তবে তার পাশাপাশি তাদেরকে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগি ও মানসিকতার গোলামেও পরিণত করে।

আর দ্বিতীয়টি মুসলমানদের জ্ঞানগত এবং ধর্মীয় উত্তরাধিকার বাঁচিয়ে রেখে যদি এক মহান খেদমতের আঞ্জাম দিয়েও থাকে, তবে সেই সাথে পার্থিব এবং যুগের চাহিদা থেকে মুসলমানদের চোখও বন্ধ করে রাখে ।

এই দ্বিমুখী নীতি শুধুমাত্র দেওবন্দ ও আলীগড়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং উপমহাদেশের যেখানেই নতুন স্কুল কলেজ স্থাপিত হয়েছে সেখানকার কর্মকর্তারা স্যার সাইয়েদের নীতিকে নিজেদের পথের মশাল বানিয়ে নেয়। একইভাবে দেশের যে কোনো অংশে কোনো দীনি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ঐ গুলোর প্রত্যেকটিতেও চিন্তার সাধারণ জড়তা থেকেই যায়। উদ্ভাবনী ও ইজতেহাদী জ্ঞান নিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান চিন্তার পরিবর্তে জীবন সমস্যাগুলোকে পাশ কাটিয়ে দেওবন্দের নীতির হুবহু অনুসরণ চলতে থাকে। আর মতপার্থক্যের এই দ্বন্দ্ব বেশ দীর্ঘ দিন চলতে থাকে।

ইতোমধ্যে উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে লেখা পড়া শিক্ষা করার পর শিক্ষিতদের একটি বিরাট অংশ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম সমাজের কল্যাণ নিয়ে যে সমস্ত মনীষী ও চিন্তাবিদ দীর্ঘ দিন থেকে চিন্তা ভাবনা করে আসছিলেন, তাঁরা অনুভব করলেন, এই শূণ্যতা যদি এখনই দূর করার উদ্যোগ নেয়া না হয়, তা হলে অবিভক্ত ইসলামী ভারত সম্পূর্ণ রূপে পরস্পর বিরোধী দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে থাকবে। তখন ইসলাম ও মুসলিম জাতির কল্যাণে কোনো ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা সাধনার সূচনা করা হলেও তাতে সাফল্য অর্জন করা কঠিনতর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

www.pathagar.com

নাদওয়াতুল ওলামা (ওলামা পরিষদ)

বস্তুত ইসলাম ও মুসলমান জাতির কল্যাণ চিন্তার এই গভীর অনুভূতি থেকেই লাক্ষ্ণৌর 'নাদওয়াতুল ওলামা' প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি স্থাপন করা হয়। লাক্ষ্ণৌতে নাদওয়াতুল ওলামার প্রতিষ্ঠান দারুল উলূম স্থাপিত হওয়া এবং এর পাঠ্য তালিকায় ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এবং আরবী ভাষা সাহিত্যে যোগ্যতা অর্জনের এমন পরিবর্তন সাধন করা হয় যে, এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা বৈষয়িক জগতে এবং এর বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কেও সচেতন হবার সুযোগ পায়। অতপর এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভকারীরা পরবর্তী পর্যায়ে দেওবন্দ এবং আলীগড়ের চরমপন্থীদের তুলনায় চিন্তায় মধ্যপন্থী বলে পরিচিতি লাভ করে। দেশের সর্বত্র এমনসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, যা তার শিক্ষা-প্রশিক্ষণ পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। লেখক শিক্ষিতদের মধ্যে এমন অসংখ্য লোকের সৃষ্টি হয় যারা নাদওয়াতুল ওলামার চিন্তাধারা এবং মন-মানসিকতার কাছাকাছি ছিলো।

নাদওয়ার আরেকটি বৈশিষ্ট হলো এই যে, একটি জীবন্ত ভাষা হিসাবে আরবি ভাষা সাহিত্যের গুরুত্বের প্রতি জোর দিয়ে এটি আরব দেশ সমূহের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক মধুর করেছে। তাদের শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্ররা বিদেশে দেশের সমস্যাবলীর ব্যাপারে বিচক্ষণতাপূর্ণ ধারণা দিয়েছে। নিজ দেশের সমস্যা পরিস্থিতির ব্যাপারে ঐ সকল দেশকে অবহিত করেছে। যখন কোনো সময় ইসলামী ভারতের মুসলিম বিশ্বের বিশেষ করে আরব দেশসমূহের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় করার প্রয়োজন দেখা দিত, তখন এই নাদওয়ার প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরাই এ কাজে আসতো। ভবিষ্যতেও হয়তো তারাই কাজে লাগতে পারে। এই তিনটি চিন্তাধারা বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এখানকার সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অপর দিকে মুসলিম দেশগুলোতে বিশৃঙ্খলা- অস্থিরতা বাড়তে থাকে।

সাইয়েদ জামালুদ্দীন আফগানী তখন এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন(১৮৯৭খৃঃ)। তবে তাঁর চিন্তাধারা ও মতাদর্শ ছিলো সজীব। তুরস্কের সুলতান আবদুল হামীদ তখন ক্ষমতাচ্যুত। তবে জামালুদ্দীন আফগানীর বিরামহীন প্রচারণার প্রভাব বিশ্ব মুসলিমকে উসমানী খেলাফতের অনেকটা কাছাকাছি নিয়ে যায়। তুর্কী সামরিক বিপ্লবের পরই ত্রিপোলী এবং বলকানে যুদ্ধ বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। অতপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথেই ভারতীয় মুসলমানদের অতি প্রিয় তুর্কী খেলাফত বৃটিশ, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে রনাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক এসব পরিস্থিতি ভারতে ইসলামী চিন্তাভাবনার উন্নতি বিধান ও তার বিকাশের বিরাট ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। ১৮৫৭ সালের পর এভাবেই আবার মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। স্বাভাবিক ভাবেই নতুন চেতনা, নেতৃত্ব এবং নতুন চিন্তাধারার প্রশিক্ষণ ও লালনকল্পে দুটি নতুন চিন্তাধারা সামনে আসে। একটি গ্রুপ উর্দু গদ্য সাহিত্যকে আর অপর গ্রুপটি কবিতা সাহিত্যকে তাদের চিন্তা প্রকাশের মাধ্যমে বানিয়ে নেয়। একদল কিতাব ও সুন্নাহকেই নিজেদের একমাত্র আদর্শ বানিয়ে নেয়। অপর দল ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশে সচেষ্ট হয়ে পড়ে।

আল্লামা ইকবাল ও আবুল কালাম আযাদের কথাই বলছি। একজন কুরআন হাদিসকে বিছানা বানিয়েছিলেন। অপরজন ইসলামের পূণর্জাগরনের চেষ্টা করছিলেন। আমার লক্ষ্য হলো আবুল কালাম আজাদ এবং ইকবাল। আবুল কালাম আজাদের দাওয়াত ও সংগ্রামের যুগ ১৯১৩ থেকে ১৯২০ খৃ. -এর কিছু পর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ঐ সময় তাঁর বক্তৃতা এবং লেখনীর মাধ্যমে শুধুমাত্র হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের চিন্তাধারাই প্রভাবান্বিত হয়নি, বরঞ্চ তাদের জীবনধারা পর্যন্ত পাল্টে যায়। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যিনি নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং আশ্চর্য লেখনি ও বক্তৃতার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ঘুমন্ত বিবেককে জাগ্রত করেছিলেন, আস্তে আস্তে তাঁর চিন্তা ও কার্য এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেলো, যেখানে অতি নিষ্ঠাবান ভক্তের পক্ষেও তাঁর কথা ও কাজের সমর্থন দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে ইসলামের জাগরণে ইকবালের ভূমিকা এবং তার প্রভাব বলয় ক্রমশ: বাড়তে থাকে। সত্যকথা, হলো ঐ যুগেই ইকবালের চিন্তা ও দর্শন এবং তাঁর রচনাবলী ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠনে ও লালনে অনেক সাহায্য করে। আর জীবনের শেষ বছরগুলোতে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামতো মুসলিম ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখার দাবী রাখে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব

ত্রিপোলি ও বলকানের হৃদয় বিদারক ঘটনাবলী থেকে শুরু করে খেলাফত আন্দোলন পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও আত্মোৎসর্গের মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছিল, ইসলামী চিন্তা ও আন্দোলনের উপর তার ভালো প্রভাব পড়েছিল। এই সব আন্দোলনে যারা যারা যোগ দিয়েছিল, তারা মানসিক ও দৈহিক সর্বদিক দিয়েই পূর্ণাঙ্গ মুসলমান ছিলেন। তাঁদের উঠাবসা, চিন্তা- চেতনা ও চাল- চলনের পদ্ধতি পাল্টে গিয়েছিল। সেই

www.pathagar.com

খেলাফত আন্দোলনের নেতাদের নেতা ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ আলী জাওহর। আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র সমাধির উপর ক্ষমা ও রহমতের পুষ্প বর্ষণ করুন। বর্তমান রাজনীতিবিদদের তুলনায় তাঁরা এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের অন্তকরণ ইসলামের যথার্থ ভালোবাসায় উজ্জীবিত ছিলো এবং তাদের কাছে কোনো কিছু গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের মাপকাঠি একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। যত দিন পর্যন্ত নেতৃত্বের চাবিকাঠি তাদের হাতে ছিলো, মুসলমানদের সামগ্রিক রাজনৈতিক তৎপরতা পুরোপুরি ইসলামের লক্ষ্য পানে পরিচালিত না হলেও অন্ততঃ পক্ষে ইসলামী রীতিনীতির অনুসারী ছিলো। কিন্তু এই পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার নিভু নিভু প্রদীপটিও নিভিয়ে দিলো। মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক এবং আমানুল্লাহ খানের আবিস্কৃত আধুনিকতাবাদ আমাদের পাশ্চাত্য পুজারীদের আস্কারা পাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। অপরদিকে ওলামায়ে কেরাম হয় রাজনীতি থেকেই দূরে সরে থাকতেন। আর খেলাফত আন্দোলনের সময় যদিওবা কেউ রাজনীতিতে প্রবেশ করতেন, তারা নিজেদের মৌলিক কর্তব্য সমূহকেও ভুলে থাকতেন।

অতপর অনুকূল পরিবেশ পেয়ে চিন্তাগত বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এটা উনত্রিশ বা ত্রিশ সনের কথা। এই চিন্তার বিকৃতির নেতৃত্ব দিয়েছিল লক্ষ্ণৌর তৎকালীন সাময়িকী 'নিগ্যার'। পাশাপাশি হাদীস অস্বীকারকারীদের ফেতনাও নতুন পোষাকে সজ্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বদজাত শিশুটিরও প্রাথমিক লালন পালন নিগারের কার্যালয়েই সম্পন্ন হয়।

অতপর অমৃতসরে নিগারের কপালে জুটলো অনুকূল আবহাওয়া । তারপর দিল্লীর শাসকদের প্রাসাদে তার জন্যে ব্যবস্থা হয় নিরাপদ বাসস্থানের । আর দেশ বিভাগের পরে তা পাকিস্তান সচিবালয়তে স্থানান্তরিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত দিল্লীর এক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক যিনি আল্লাহর ইচ্ছায় একজন সম্ভ্রান্ত হাদীসবেত্তা এবং আহলে হাদীস গোষ্ঠির একজন বিখ্যাত আলেমের সন্তান - দীর্ঘ সময়কাল ধরে তার পৃষ্ঠপোষক হয়ে থাকেন। নিগার - এর ফেতনা এবং হাদীস অস্বীকারকারীদের ফেতনা এই দুই ফেতনার মূলোৎপাটনের লক্ষ্যে যে সমস্ত মহান ব্যক্তিত্ব অমূল্য অবদান রেখেছেন এবং বছরের পর বছর ধরে রসূলের (স) সুন্নাতকে সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠাকল্পে যারা জীবন বাজি রেখে কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী এবং মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর নাম উল্লেখযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ।

www.pathagar.com

খেলাফত আন্দোলনের প্রভাবে যে ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তা খুব কমই স্থায়ীত্ব লাভ করে। তা ছিলো সুস্পষ্ট চিন্তাচেতনাহীন একটা আবেগ ভরা আন্দোলন। এজন্যে যখনই তার বিশেষ মনস্তাত্বিক পরিস্থিতির ও পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলো, অমনি টলটলয়মান ধার্মিকতাও শেষ হয়ে গেল এবং ধর্মদ্রোহিতার মনোভাব আবার মাথা তুলে বসলো। এ ব্যাপারে একটু আগেই ইংগিত দিয়েছি। ইতোমধ্যে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হতে লাগলো। ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস যার মধ্যে স্বাধীনতা প্রিয় হিন্দু এবং মুসলমানরাও একত্রিত হয়েছিল - দেখতে দেখতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহী হয়ে গেল এবং তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। তাদের মধ্যে একটি দল কংগ্রেসের এই আচরণ সত্ত্বেও তার সাথে একাত্মতা বজায় রাখলো এবং তারা হিন্দু মুসলিম সম্মিলিত জাতীয়তাবাদের এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করলো। দ্বিতীয় দলটি মুসলিম কনফারেন্স এবং মুসলিম লীগের পতাকা তলে মুসলিম জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহী হয়ে গেল। উভয় দলের মধ্যে এক সীমাহীন দ্বন্দ্ব সংঘাতের সূচনা হলো। সম্মিলিত জাতীয়তাবাদের অনুসারীরা এক পাঁচমিশালী সম্মিলিত সংস্কৃতি ও সম্মিলিত জাতীয়তাবাদের গুণ গেয়ে চলছিল। আর তার ফলে অখন্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রেরণা শক্তিশালী হচ্ছিল। ক্রমেই সম্রাট আকবরের আমলের হিন্দুয়ানী জাহেলিয়াতের প্রতি মুসলমানদের প্রত্যাবর্তনের রাস্তা উম্মুক্ত হয়ে পড়ছিল। অপর দিকে মুসলিম জাতীয়তাবাদের পতাকাবাহীরা মুসলিম সভ্যতা এবং মুসলিম জাতীয়তার উপর ভিত্তি করে এক নতুন আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলনে যদিও বাহ্যত ইসলামের সাথে একাত্বতার এক সুখকর প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তার চালচলন পরিষ্কার ভাবে একথারই ইঙ্গিত দিতো যে, এই আন্দোলন ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক হওয়ার পরিবর্তে তুর্কী, ইরানী ও মিশরী আন্দোলনের ন্যায় নিছক একটি স্বাধীন মুসলিম জাতি সৃষ্টির লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছিল।

অখন্ড ভারত প্রেম ও মুসলিম জাতি প্রেমের এই দ্বন্দ্ব দিন দিন বেড়ে চলতে শুরু করলো এবং মুসলমানদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হতে লাগলো। এই ধারাবাহিকতার সবচেয়ে বড় ট্রাজেডী এই যে, আলেমদের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন জমিয়তে ওলামা কংগ্রেসের এবং তার অনুসৃত নীতির প্রবল সমর্থক হয়ে গেলো। তারা অত্যন্ত উগ্রতার সাথে আপন নীতিমালার উপর অটল থাকলো। এর ফল এই দাঁড়ালো যে, নবীন ও অনভিজ্ঞ মুসলিম জাতীয়তাবাদী

www.pathagar.com

আন্দোলন যার নেতৃত্বে প্রথম থেকেই ইসলামের জ্ঞান ও ইসলামী চেতনা ছিলো কম,আলেমদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়লো। এই সংঘাত শুধুমাত্র আলেমদের হেয় করেনি, বরঞ্চ তার সাথে সাথে ইসলামের প্রভাব প্রতিপত্তির বিপুল ক্ষতিও সাধন করেছিল।

ইসলামী আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের এই দ্বন্দ্ব সংঘাত কোথায় গিয়ে থামতো কেউ জানে না, যদি এর বিপরীতে ইসলামের একজন দরদী আলেম যথা সময়ে অনাগত ভবিষ্যত সম্পর্কে নির্ভুল অনুমান করে নিয়েছিলেন। উনিশ শত তেত্রিশ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদ দাক্ষিণাত্য থেকে 'তরজুমানুল কুরআন' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তিনি সত্যের দাওয়াতের জন্য ময়দান অনুকূলে আনার প্রচেষ্টা শুরু করে দিলেন। প্রথম চার পাঁচ বছর চিন্তা ও ধ্যান ধারণার পরিশুদ্ধি এবং ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরনের ভুল বুঝাবুঝি অপনোদনের কাজ করেন। এই সংস্কার ও সংশোধনের কাজ অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে অখন্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতীয়তার দ্বন্দ্ব যখন ঝড়ের আকৃতি ধারণ করলো, তখন পৃথিবীর বুকে পুনরায় ইসলামের সঠিক ও নির্ভেজাল দাওয়াত উপস্থাপন করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো। এই প্রেক্ষাপটে "তরজুমানুল কুরআন" এর সম্পাদক অখন্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মূলোৎপাটনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আজকে শুধু তার সমর্থকরাই নয় বরং বিরোধীরা পর্যন্ত এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, 'তরজুমানুল কুরআন' - এর আপোষহীন ধারাবাহিক নিবন্ধ সমূহ যদি প্রকাশিত না হতো, তাহলে হিন্দু মুসলিম একক জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে উচ্ছেদ করা সহজ ছিলনা।

এ এক বাস্তব সত্য কথা যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে 'তরজুমানুল কুরআনের' ক্রমাগত আক্রমনের ফলে মুসলিম লীগ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিপুল শক্তি অর্জন করেছিল এবং ঐ নিবন্ধগুলো ঘরে ঘরে পৌছে দিতে লীগের নেতৃবৃন্দ পুর্ণরূপে সহযোগিতা করেন। কিন্তু যখনই এই আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় সামনে উপস্থিত হলো,তখন তরজুমানুল কুরআনের সম্পাদক সাহেব মুসলিম জাতীয়তাবাদের দুর্বলতা এবং তার ধারক বাহকদের ভারসাম্যহীনতা প্রকাশ করে দিতে লাগলেন। তিনি ইসলামের সঠিক পথ থেকে তাদের বিচ্যুতিকে সাধারণ মুসলিম জনগণের সামনে তুলে ধরলেন।

www.pathagar.com

ফলে তখন তাদের দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর কেউ থাকলো না। আসলে ইসলামের প্রতি তাদের কোনো ভালোবাসাই ছিলনা। বরং তারা নিজেদের জন্মভূমি ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং আদত-অভ্যাস ও রসম রেওয়াজকেই বেশি ভালোবাসতেন। যখন তাঁদের সামনে নিরেট শিরকের প্রতি নিন্দা জানানো হতো, তখন তাদের মুখে 'সুবহানাল্লাহ' এবং 'মা'শাল্লাহ' উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হতো। আর যখন জাহেলী রসম রেওয়াজ ও অনৈসলামী প্রথাকে নিন্দা করা হতো, যা তৎকালীন ইসলামী সমাজে বিদ্যমান ছিল তখন তাদের কপাল কুঞ্চিত হয়ে যেতো। এটা কোনো সত্যনিষ্ঠ জাতির নীতি নয়। এটা পথভ্রষ্ট জাতির অভ্যাস। সার কথা, তরজুমানুল কুরআনের সম্পাদক সাহেব হিন্দু মুসলিম এক জাতীয়তাবাদের মুলোৎপাটনের কাজ সম্পন্ন করা মাত্রই কালবিলম্ব না করে আপোষহীন ভাবে নির্ভেজাল ও পরিপূর্ণ ইসলামের দাওয়াত দানকে নিজের চেষ্টা সাধনার লক্ষ্যবিন্দু স্থির করে নেন। যাতে করে মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আতাতুর্ক এবং রেজাশাহীর আর্দশের দিকে ধাবিত হওয়া থেকে বিরত রাখা যায়। আর মুসলমানদের মধ্যে যে নব জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে, তাকে দীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করা যায়।

এ দাওয়াত কোনো নতুন দাওয়াত ছিলনা। এ দাওয়াত ছিল হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে সাইয়েদুল মুরসালীন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সমস্ত নবী- রসূলগণ যে দাওয়াত দিয়ে গেছেন এবং এর পরে মুসলিম জাতির খাঁটি মনীষীগণ যে দাওয়াত দিয়ে গিয়েছিলেন - অবিকল তাই। কিন্তু আপনারা তো এটা ভালো করেই অবগত আছেন, পরিপূর্ণ ও খালেস আপোষহীন দাওয়াতকে স্বয়ং মুসলিম দাবীদাররাও কখনও ঠান্ডা অন্তকরণে গ্রহণ করেনি। এটা অতি নিকট অতীতেরও অভিজ্ঞতা। আর আজও আমাদের চোখের সামনে এই চিত্রই স্পষ্ট।

উনচল্লিশ থেকে একচল্লিশ পর্যন্ত তরজুমানুল কুরআন -এর সম্পাদক সাহেব ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর দীনের প্রতি আহবান জানাতে থাকেন । দীন প্রতিষ্ঠার সুশৃংখল চেষ্টা সাধনার লক্ষ্যে লোকদেরকে প্রস্তুত ও উদ্দীপিত করতে থাকেন। প্রথম প্রথম আল্লাহ্‌র যে সব সৎ ও সাহসী বান্দা এই দাওয়াতের শুভ সূচনা করেন এবং লাব্বায়েক বলে আওয়াজ উচ্চারণ করেন, সেই সব ব্যক্তিরাই একচল্লিশ সনে নিজেদেরকে একটি ইসলামী সংগঠনের আকারে সংগঠিত করে নেন। তরজুমানুল কুরআনের সম্পাদক সাহেব সর্বসম্মতি ক্রমে এই জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন।এই ঐতিহাসিক সংগঠনেরই নাম জামায়াতে ইসলামী ।

www.pathagar.com

একচল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ সন পর্যন্ত এই নব গঠিত সংগঠনের সুশৃংখল চেষ্টা সংগ্রামের এবং দাওয়াতের সরগরম যুগ ছিলো। সঠিক অর্থে ভারতীয় ইতিহাসে এটাই ছিলো দ্বিতীয় ইসলামী আন্দোলন যা সঠিক পথের উপর যাত্রা শুরু করে । এই আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচীর উপর ব্যাপক বই পুস্তক বিদ্যমান রয়েছে যা অধ্যয়ন করে তার যথার্থতা অনুধাবন করা যায়।

মুসলমানরা দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একত্রিত হোক - এর পূর্ণ চেষ্টা এই সংগঠন (জামায়াত) করতেথাকে। কিন্তু তার ঐক্যবদ্ধ গতি ব্যাহত হয়। মুসলিম ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব সংঘাতের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে দুটি নতুন দেশের সৃষ্টি হয়। একটি ভারত যেখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পূর্ণভাবে হিন্দুদের হাতে চলে যায়। সেখানকার মুসলমানরা পুরোপুরি হিন্দুদের পদানত হয় ।

দ্বিতীয়টি হলো পাকিস্তান যেখানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ রূপে মুসলমানদের হাতে এসে যায়। সাবেক ভারতবর্ষের অর্ধেকেরও কিছু বেশি মুসলিম অধিবাসী এই ক্ষমতা অর্জন করে। তারা যদি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইতেন তাহলে তা করতে সক্ষম হতেন।

এই দেশ বিভাগের পর ইসলামী আন্দোলনের পতাকাধারী সংগঠন জামায়াতে ইসলামীও বিভক্ত হয়ে গেলো। জামায়াতের কর্মীবৃন্দের মধ্যে যারা বিভক্তির সময় ভারতে রয়ে গেলো তারা এক পৃথক জামায়াতে পরিণত হয়। আজ তারা যেভাবে দৃঢ়তার সাথে কোনো সাহায্য সহযোগিতা ব্যতিরেকেই সত্য দীনের দাওয়াতের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে, তা উপমহাদেশের বাদ বাকী মুসলমানদের জন্য ঈর্ষার বস্তু।

আল্লাহর কি অপার মহিমা, যে সমস্ত বড় বড় আলেমে দীন বড় বড় দীনি প্রতিষ্ঠানের মসনদে সমাসীন ছিলেন, একক জাতীয়তাবাদের খারাপ পরিণতি চোখে দেখেও তাদের সম্বিত ফেরেনি। বরং তারা তা দেখে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে নিকৃষ্ট ধরনের পথভ্রষ্টতা অর্থাৎ ধর্মহীনতার পৃষ্ঠপোষক হয়ে গেলেন। কিন্তু যাদের মাথা কোনো দারুল উলূমের পাগড়ীতে ভূষিত হয়নি, আজ তারাই সারা ভারতে ভাষা বর্ণ ও অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও ধর্মহীনতাকে প্রত্যাখান করছে। তারা ইসলামী জীবন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে যাচ্ছে। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস এই যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের মসনদে সমাসীন ঐ সব বড় বড় বুযুর্গের মনে জামায়াতের এই সব ত্যাগী সত্যনিষ্ঠ বান্দার দুঃসাহসী কার্যকলাপ দেখে কিছুমাত্র লজ্জা হওয়া তো দূরের

www.pathagar.com

কথা, বরং তারা আজ উঠে পড়ে লেগেছে, ঐ আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য, যা সারা ভারতে সত্যের জন্যে আপোষহীন কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে। কারণ এ আওয়ায উচ্চারিত হতে থাকলে তাদের নিজস্ব ধর্মীয় সুনাম ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে। ইতিহাসের পাতায় এ আশ্চর্য বিষয়টিও স্মরণীয় হয়ে থাকবে যে, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ধারক বাহকগণ তো তাদের দরবারে খাঁটি মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু তাদের ফতোয়া কেন্দ্র থেকে গোমরাহ ও বেদীন বলে ফতোয়া দান অব্যাহত থাকলো সেই বীর মুজাহিদদের বিরুদ্ধে,যারা সারা ভারতের মুলসলমান ও অমুসলমানদেরকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি অকুণ্ঠ চিত্তে আহবান জানিয়ে যাচ্ছেন নিরবধি।

এতো গেলো ভারতের ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা। বাকী থাকলো পাকিস্তান প্রসংগে। এখানে ভারত বিভক্তির পর জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নামে এক পৃথক জামায়াতের ভিত্তি স্থাপিত হয় এই জামায়াত পরিবর্তিত অবস্থা ও পরিবেশের আলোকে ভিন্নতর কর্মসূচী অবলম্বন করে। এটি একটি স্বাধীন দেশ এবং তারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকারী। এজন্যে এখানকার জামায়াতে ইসলামী বিভক্তির পরপরই দেশত্যাগী ও আশ্রয় প্রার্থীদের সাহায্য সহযোগিতা সম্পন্ন করেই ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবীতে আন্দোলন শুরু করে দেয়। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের অসন্তোষ সত্ত্বেও এ কাজ অব্যাহত থাকে। শেষ অবধি তাঁরা তাদের সর্বসম্মত ২২ দফা আদর্শ প্রস্তাব পাশ করতে ক্ষমতাসীনদেরকে বাধ্য করলো। প্রকৃত পক্ষে এটি ছিলো নবীন রাষ্ট্রটির মুসলমান হওয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

আদর্শ প্রস্তাব পাশ করার পর জামায়াতের কাজ দুভাগে ভাগ করা হলো। প্রথমত: সর্বজনীন দাওয়াত ও প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মানসিক ও চারিত্রিক সংশোধনের কাজ। যাতে করে ইসলামের বিধি বিধান প্রতিষ্ঠা ও চালু করার উপযুক্ত ময়দান প্রস্তুত হয়। দ্বিতীয়ত: তাঁরা আদর্শ প্রস্তাবের লক্ষ্য অনুসারে শাসন ব্যবস্থার সংস্কারের চেষ্টা চালিয়ে যায়,যাতে রাষ্ট্রীয় সংবিধান ইসলামী হয়, দেশের আইন-কানুনও ইসলামী হয় এবং যাতে করে কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ আসনে এমন সব লোক আসে যাদের চিন্তা চেতনা এবং চরিত্র ইসলামী হয়।

এ কাজে যারা জামায়াতে ইসলামীর বিরোধিতা করছে, তন্মধ্যে পাশ্চত্য সভ্যতায় অতিমাত্রায় প্রভাবিত লোকদের বিরোধিতা তো বোধগম্য। কারণ

www.pathagar.com

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ছিলো তাদের নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা এবং ফাসেকী আদত-অভ্যাস -এর পরিপন্থী। সমাজবাদীদের প্রতিবন্ধকতাও আমাদের সামনে পরিষ্কার। কারণ যেখানে মুহাম্মদ (স) এর ব্যবস্থা চালু হবে সেখানে মার্ক্স লেনিন এর মতবাদ চালু হওয়া অসম্ভব। পথ ভ্রষ্টদের প্রতিবন্ধকতাও আমাদের কাছে দুর্বোধ্য নয়। কেননা তাদের প্রত্যেকেই একথা ভালো করে বুঝে যে, তাদের সম্মানের স্থান ততোক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকবে যতোক্ষণ পর্যন্ত কুরআন হাদীসকে উপেক্ষাকারী একটি ফাসেক নেতৃত্ব ক্ষমতাসীন থাকবে।

কিন্তু যদি কারো বিরোধিতা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে থাকে তবে তা হলো, এক শ্রেণীর আলেম ওলামার বিরোধিতা। কেননা তারা নিজেরাই বলে, পাপাচার ও অন্যায় আচরণের এই জোয়ার তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু যখন জামায়াতে ইসলামী অগ্রবর্তী হয়ে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা সাধনা করে, তখন তারা প্রতি পদে পদে তাদের রাস্তা বন্ধ করার অপচেষ্টা করে। আর তাদের সমস্ত সহানুভূতি ঐ সমস্ত ফাসেকী নেতৃত্বের প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়, যা যাবতীয় গোমরাহী এবং ফাসেকীর লালন পালনকারী ও পৃষ্ঠপোষক। এই কার্যপদ্ধতির কারণ কি? এ প্রশ্ন আমাকে অনেকেই করেন। কিন্তু এর কোনো উত্তর আমার জানা নেই । মনে হয় এই রহস্য এই পৃথিবীতে রহস্যই থেকে যাবে। তবে অবশেষে একদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন সমস্ত রহস্যের ওপর থেকে পর্দা উঠে যাবে।

সমাপ্ত

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর কাজের সূচনা হয় ১৯৪৯-৫০ সালে। তবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইসলামী আন্দোলনের কার্যক্রম শুরু হয় আরো ৩/৪ বছর পর। ১৯৫৩ সালে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় টীম তিন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সব জেলায় ব্যাপক সফর করেন। এ সফরের পরই জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে ওঠে। ১৯৫৬ সালের শুরুতেই মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। ৪০ দিনব্যাপী এ সফরে তিনি সকল জেলায় সভা-সমাবেশের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অতপর তাঁর উপস্থিতিতেই জামায়াতের বিভাগ ভিত্তিক সংগঠন কায়েম হয়। সে হিসেবে বলা যায়, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশ নামক ভূখন্ডে ইসলামী আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয় ১৯৫৬ সালে।

- সম্পাদক

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন
জামায়াতে ইসলামী। জামায়াতের ইতিহাস জানার
জন্যে পড়ুন জামায়াত-প্রতিষ্ঠাতা
মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর
জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ইতিহাস কর্মসূচি
এবং প্রবীণ জামায়াত-নেতা
আব্বাস আলী খানের
জামায়াতে ইসলামের ইতিহাস